Heritage Institute of Technology,

Kolkata

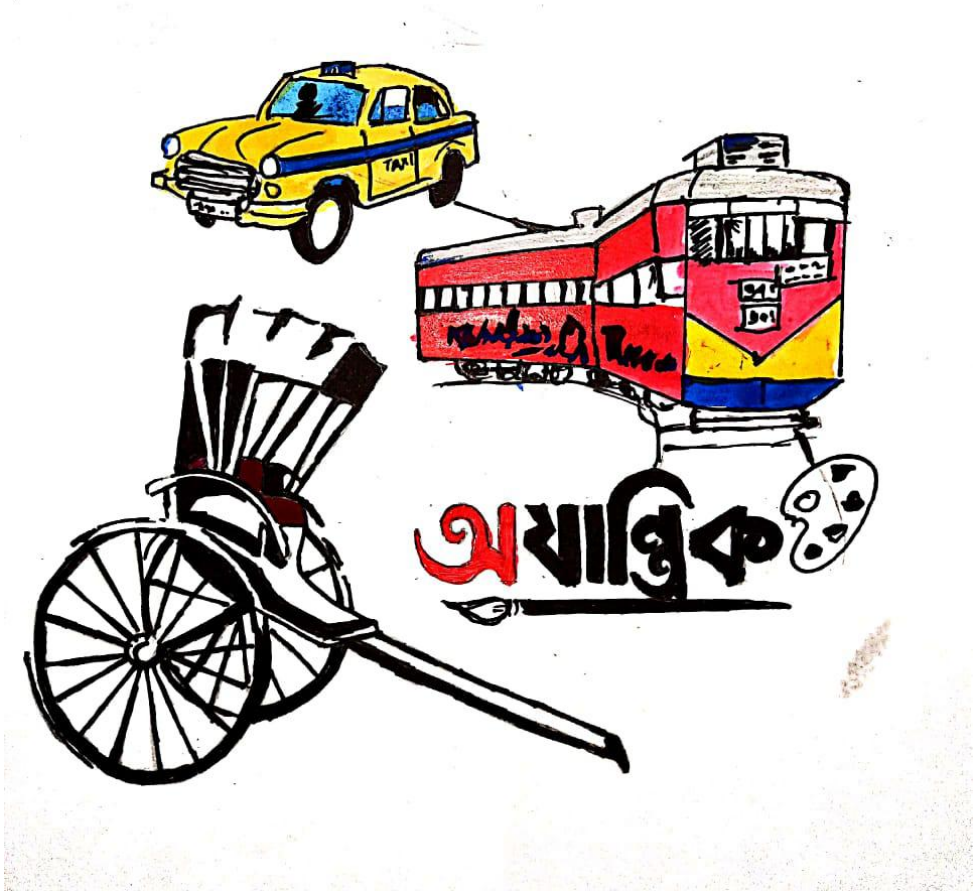

A tribute to Gurudev Rabindranath Tagore

An Initiative by the Students

Of the Mechanical Engineering Department

মুখবন্ধ

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, এবং মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়ে, দীর্ঘ্য এক বছর প্রতীক্ষার পর আসে পয়লা বৈশাখ। চৈত্রের অবসানে পুরাতন বছর বিদায় নেয়; আসে নতুন বছর। নববর্ষ। পৃথিবীর সর্বত্রই, সকল সভ্যতায় নববর্ষ একটি 'ট্র্যাডিশন' বা প্রচলিত সংস্কৃতিধারা। পুরাতন বছরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রির অন্তিম প্রহর অতিক্রম করে, তিমির রাত্রি ভেদ করে পূর্ব দিগন্তে উদিত হয় নবপ্রভাতের জ্যোতির্ময় সূর্য। প্রকৃতির নিসর্গ মঞ্চে ধ্বনিত হয় নব-জীবনের সংগীত। আকাশ সেজে ওঠে অপরূপ সাজে- পত্রে পত্রে অনুভূত হয় তার পুলক-শিহরণ। গাছে গাছে ছড়িয়ে পড়ে তার আনন্দ-উচ্ছ্বাস। পাখির কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয় নবপ্রভাতের বন্দনা-গীতি। অভিনন্দন- শঙ্খধ্বনিতে হয় নূতনের অভিষেক। রাত্রির তপস্যা শেষে এই শুভদিনের উদার অভ্যুদয়ে, মানুষের হৃদয়-উৎসারিত কলোচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে পৃথিবী। কল্যাণ ও নতুন জীবনের প্রতীক নববর্ষ। নতুন দিনের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা- প্রার্থনা করি দুঃখজয়ের। বিশেষতঃ, আজ বিশ্বব্যাপী এই কঠিন, সঙ্কটঘন মুহূর্তে প্রার্থনা করি আরোগ্যের ও নির্মলতার।

বাংলা নতুন বছরে পদার্পণ করে আমরা গৃহবন্দী হয়ে অতিক্রান্ত করেছি বেশ কয়েকটি দিন। এমত অবস্থায় ২৫ শে বৈশাখের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অন্তরাকাশে অনুভব করেছি আর এক 'রবির' - এক অনন্য মহাজীবনের উদার-সান্নিধ্য। বর্ষারম্ভের রেশ যখন এখনো মৃয়মান হয়নি, তখন ২৫ শে বৈশাখের পুণ্য-লগ্নে আমাদের মনন-আকাশে এই মানব সূর্যের আলোকধারায় আমরা শুচি-স্নাত হয়ে অনুভব করি যে এই সঙ্কটকালও ক্ষণস্থায়ী।

বাঙ্গালীর বর্ষারম্ভ এবং রবীন্দ্রজয়ন্তীর মিলিত ভাবধারা রূপকথার জিয়ন-কাঠির মত বিগতকালের ও বর্তমানের সকল জ্বরাজীর্ণতা দূরীভূত করে নিয়ে আসুক আনন্দ অনুভূতি, একের অন্যের প্রতি সহমর্মিতা, এবং এই কঠিন পরিস্থিতিকে লঙ্ঘন করে নূতনের সন্ধানে এক সাথে মোকাবিলা করার স্পর্ধা।

ধন্যবাদান্তে,
সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
(Faculty Coordinator)
"MECHATRIX"

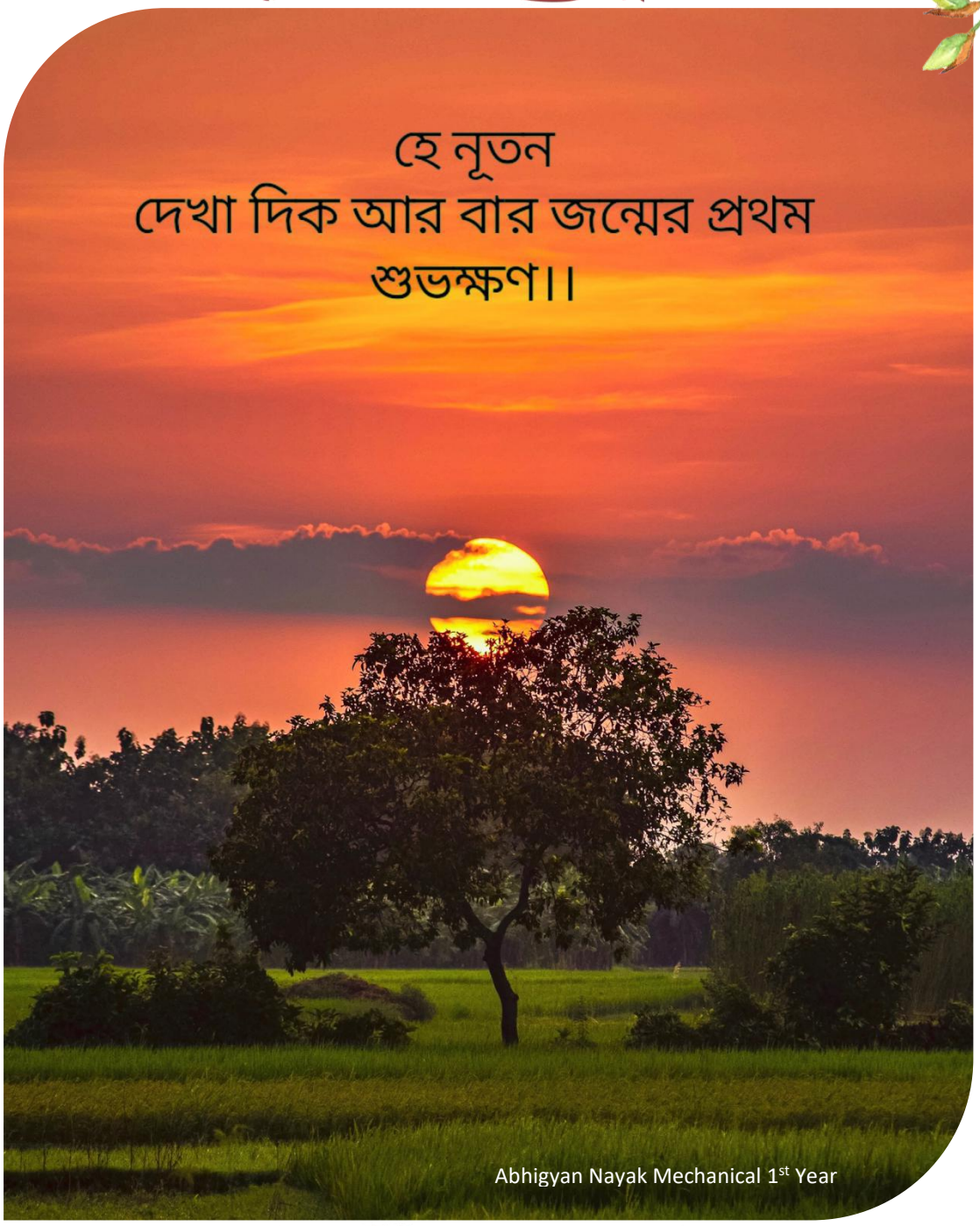
হে নূতন
দেখা দিক আর বার জন্মের প্রথম
শুভক্ষণ।।
Abhigyan Nayak Mechanical 1st Year

খোলা হাওয়া

"আহা কি আনন্দ, আকাশে বাতাসে"
" শাখে শাখে, পাখি ডাকে, কত শোভা চারিপাশে"
" আহা কি আনন্দ, আকাশে বাতাসে", ফোনের দুপ্রান্ত থেকেই জমে উঠেছে খোলা হাওয়ায় দরাজ সুরের খেলা।

একরকম আঁটিসাঁটি বেঁধেই আজ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেছে আঁখি। চোখমুখের ঘুমটুকু ধুয়েই সাত তাড়াতাড়ি ঠাকুরদাকে ভিডিও কল। সেই কলের শুরুতেই বুড়ো স্বরে শৈশবের তাল আর তার সাথে তাল মিলিয়ে নতুন স্বরে পক্ক গায়কিতে নতুনকে আলিঙ্গন।
" শুভ নববর্ষ ঠাকুরদা, আমার প্রণাম নিও।"
" শুভ নববর্ষ দিদিভাই। তুমিও আমার মনের সব স্নেহটুকু নিও। নতুন বছরের নতুন সকালের আলোর মতই প্রস্ফুটিত হোক তোমার জীবন শতদল খানি।"
"এবছরের শুরুটা খুব অন্যরকম লাগছে ঠাকুরদা। যদিও তুমি আকাশে বাতাসে আনন্দের হুল্লোড় তুলছো , তবে আমার কিন্তু মোটেই ভালো লাগছে না দাদা। চারিদিকটা কেমন ভারী হয়ে রয়েছে। একটা ভয় যেন অনিশ্চয়তার কূপে আমাদের শহর'টাকে বন্দী করে দিনরাত পাহারা দিয়ে চলেছে...বড্ড অস্থির লাগছে দাদা। "
" অনিশ্চিয়তা আছে বলেই তো আমরা স্বপ্ন দেখতে শিখি দিদিভাই, আর এই চার পয়সার আটপৌরে জীবনে সেইটুকুই তো সত্যিকারের বায়োস্কোপ।", এবার খানিকটা থেমে, একটু কৌতুকের সুরেই ঠাকুরদা বলল, "আচ্ছা, আজ যে তুমি এই বুড়োদাদা'টাকে আবার খানিকটা নতুনের লোভ দেখাতে এই সক্কাল সক্কাল ঘুম থেকে উঠলে, তাতে বুড়ো প্রাণটায় স্ফূর্তির শেষ নেই, কিন্তু তোমার যে ঘুমটা নষ্ট হলো দিদিভাই। এটা বড়ই অবিচার হল, বলো?"
অভিমানী সুরে আঁখির তীব্র প্রতিবাদ, "মোটেই না। এবার কিন্তু দাদা তুমি মায়ের মতন কথা বলছো, এসব কিন্তু একদম ঠিক নয়। পয়লা বৈশাখের সকাল বেলায় তোমার সাথে গঙ্গার ধারে নয়, হাওড়া ব্রিজের ওপরে নয়, কিম্বা সোনাঝুরির লালমাটিতে নয়, আমায় শুধুই ভিডিও কলিং এর ফ্যাকাশে ছবিতে তোমায় দেখতে হচ্ছে। অথচ প্রতিবছর এই দিনটার সকাল মানেই আমার জন্য তোমার সাথে এক্সপিডিসানে বেরোনো.."
আঁখিকে মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে, "আবার এক্সপিডিশন কেনো? অভিযান বলো। বাঙালির নতুন বছরটা আরেকটু বাংলা দিয়েই না হয় শুরু হোক", চোখ নাচিয়ে হেসে হেসে বলল ঠাকুরদা।
আলতো লজ্জা মুখে, মিথ্যে মিথ্যে রাগ দেখিয়ে "হ্যাঁ, তা এই পয়লা বৈশাখের সকালটা যে আমাদের অভিযানের জন্যই বরাদ্দ থাকে, তা বুঝি তুমি জানো না!', 'অভিযান' শব্দে একটু বেশি করেই জোর দিয়ে নাক ফুলিয়ে বলল আঁখি, "ঠানদি বলত বছরের প্রথম দিনটা যেমন করে কাটানো হয়, সারাটা বছর সেইরকমই কাটে। আর ছোট থেকে বছররের এই দিনটার জন্যই আমি সবচেয়ে বেশি অপেক্ষা করে থাকি। তুমি, আমি আর ঠানদি। সবার সেরা তিনমূর্তি", ঠানদির কথা বলতেই একটু উদাস হয়ে গেছিল সে।
উদাস হাওয়ার পথ ভোলাতে ঠাকুরদা মুচকি হাসিতে ব্যাঙ্গের সুরটা অবিরত রেখেই বলে চলল, "সে বচন যদি সত্যি হয় তবে তো আরও মুশকিলের কথা দিদিভাই, তোমায় তো তাহলে রোজ সক্কাল সক্কাল উঠতে হবে"।
"ঠাকুরদা, ধ্যাত!", কঠিন অনুযোগ করে আঁখি বলতে থাকে, "আচ্ছা, তুমি তো জানোই রাতের নির্জনতাটা আমার বড্ড পছন্দের। শব্দ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, নীরবতা তখনই তো কথা বলে। আর সেই

কথায় এক অদ্ভুত আর্তি আছে, অনুরাগ আছে। রাত্রিকে আমি উপভোগ করি ভীষণভাবে। আমার কাজের মধ্যে একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি ওই সময়টায়। তাই ঘুমোতে দেরি হয়, আর তাই সকালে উঠতেও দেরি হয়।"

"হুহুহুম, কিন্তু দিদিভাই তুই আমায় একটা কথা বল, আঁধারের কোল আলো করে সূর্যটার জন্ম নেওয়া না দেখলে, আর সেই জন্মোৎসবে প্রকৃতির কলকাকলি- সেসব না শুনলে রবীন্দ্রনাথের কলমে কি ধরা দিত ' আজি এ প্রভাতে রবির কর, কেমনে পশিল প্রাণের পর, কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাত পাখির গান ' ?"

" আহা, আমি তো কখনোই সকালে উঠি না এমনটা নয়। তাছাড়া দেখো দাদা, রবি ঠাকুর যদি এযুগের ছেলে হতো সেও নিশ্চই মাঝে মাঝে দুপুর গড়িয়ে ঘুম থেকে উঠতো। আর তাঁর কথা যখন তুললেই এ প্রসঙ্গে আমার খানিক বলার আছে। আচ্ছা তোমার কি মনে হয় না, রবি ঠাকুর যদি এই ১৪২৭ বঙ্গাব্দে, নিউটাউনের এক আকাশচুম্বী আবাসনের জানলায় বসে, বৃষ্টির রিমঝিম ছন্দে, আর উড়োজাহাজের ভোঁ শব্দের ছন্দপতনে কলম ধরতেন, তবে সেই কলমের খোঁচায় আবারও কি ক্ষত বিক্ষত হত না আমাদের সমাজ, সেই আমাদের পুরোনো জ্বরা জীর্ণ সমাজ? হাজার বছরের অর্থহীন সংস্কারগুলোকে, 'আমি ঠিক, শুধু আমিই ঠিক' এই দম্ভের জমকালো পোশাক খুলিয়ে বেআব্রু করার ঔদ্ধত্য দেখতে তিনি কিন্তু পিছ্‌পা হতেন না। আর আজ যে সমাজ রবীন্দ্রনাথ বলতে গদগদ গলা করে তার গান গাইছে, সেই সমাজই তখন তাকে বখাটে বা বেয়াড়া ছেলে বলে সম্বোধন করত। সমাজের মনে হয় রবি ঠাকুর পুরোনো, আর যাহাই পুরোনো তাহাই সংস্কৃতি, তাহাই ঠিক। তাই তো তাকে নিয়ে এত মাতামাতি!"

"সমাজের ওপর ভারী রাগ দেখছি দিদির", রসিকতার ঝোল টেনে টেনে বলছে ঠাকুরদা।

"সে তো বটেই। আমরা তো রবি ঠাকুরকে যেন আলাদিনের প্রদীপের জিনি বানিয়ে রেখেছি। যে যখন খুশি নিজের মতন করে তাকে ব্যবহার করে নিচ্ছি। কখনো তাকে ঝরিয়ে পেটের খিদে মেটাচ্ছি, কখনো বা মনের খিদে। আর আমার সব চেয়ে বেশী রাগ হয়, যখন নিজেকে রাবীন্দ্রিক প্রমাণ করতে আমরা এত বেশি ব্যাস্ত হয়ে যাই যে রবীন্দ্রনাথকেই হারিয়ে ফেলি, তাকেও সেই আমরা আমাদের মতন দু'কামরার পায়রার খোপে বাঁধতে চাই। কিন্তু সে তো আর পাঁচটা মানুষের মতন মানুষ নন, বা শুধুই মহামানব নন, রবি ঠাকুর তো একটা সুবিশাল অস্তিত্ব, একটা প্রবহমান, সাবলীল চিন্তাধারা। তাকে পান করলে শুধু যে তৃষ্ণা মেটে তা নয়, বরং সুস্বাদু কোনো পানীয় আস্বাদনের অনুভূতি হয়, তাকে বার বার পেতে ইচ্ছে হয়। তুমি দেখো ঠাকুরদা, রবি ঠাকুর গেয়েছেন, ' পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায়, ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায় '- তার এই কথা শুনলে মনে হবে মানুষটা বুঝি স্মৃতিবিলাসিতার ছলে পুরোনো'টাকে আঁকড়ে ধরেই মনের আরাম পেতে চেয়েছেন। আবার এই মানুষটাই 'শেষের কবিতায়' অমিতের মুখে বলেছেন, প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সব মানুষের অবশ্যই বদলানো দরকার- আপাতচক্ষে যেন দুজন অন্য মানুষ। কিন্তু তা তো নয়। বরং একটা মানুষ যেন সবকিছুতেই নিরবিচ্ছিন্ন, আবার একই সাথে সে এমন একজন যার মাথায় জোর করেও সংজ্ঞার বোঝাটা চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তোমার কাছেই তো শোনা, রবি ঠাকুর বলতেন, আমাদের হতে হবে কাঠের হাতার মতন, সে সব হাঁড়িতে মিশবে, সব হাঁড়ির খাবারের স্বাদ নেবে, কিন্তু নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে খাবার হয়ে যাবে না। কিন্তু আজকে যারা রবি ঠাকুর রবি ঠাকুর বলে এত হুল্লোড় করছে, এত মাতামাতি করছে তাদের নিজেদের অস্তিত্ব কোথায়? তাদের একদল নিজেদেরকে সেই গোঁড়া, পুরোনো সমাজব্যবস্থাটার ধারক বাহক বানিয়ে রেখেছে , অন্য দিকে আরেকদল তেমনই পাল্লা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে সাইকেডেলিক রক সুর শেখাতে ক্ষেপে উঠেছে। আর সে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ থাকলে যেন স্বর্গবাসী রবি ঠাকুরেরও সংগীতবোধে অভাব পড়ে যায় যায় ভাব।" প্রায় এক নিশ্বাসে বলে গেলে আঁখি।

স্ক্রিনের ওপর ভাসছে ঠাকুরদার অম্লান হাসিমুখখানি। তর্কবাগীশ নাতনির প্রলাপ যে সে এতটুকু কম উপভোগ করছিল না তা তার অবিশ্রান্ত হাসিতেই ফুটে উঠছে। আঁখির বিরতিতে সুযোগ বুঝে ঠাকুরদা বলল, "বেশ। আচ্ছা দিদিভাই, তুমি এবার আমায় একটা কথা বলো দেখি, এই যে তুমি বললে,

রবীন্দ্রনাথকে সবাই তার নিজের কল্পনার অভিধান হাতে অনুবাদ করে চলেছে, আর এহেন অনুবাদ রীতিমত একটা বেপরোয়া অবস্থায় দাঁড় করিয়েছে যেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকেও, সে নাহয় মানলুম। তো তাই তুমি চাও রবীন্দ্রনাথকে সবাই তাঁর মতন করেই চিনুক, সবাই গ্রহণ করতে শিখুক তাঁর আসল পরিব্যাপ্তিটুকু। কিন্তু এই পরিগৃহিত হতে চাওয়ার ইচ্ছে'টাতেই তো তুমি ধরা দিলে সেই সমাজের কাছেই, দিদিভাই। ভুলভ্রান্তিতে ভরা সমাজ, কখনো শিশুর মতন অবুঝ, কখনো বৃদ্ধের মতন অনড়। তো যে সমাজের অংশ হাওয়া তোমার কাছে গর্বের নয়, সেই সমাজেরই স্বীকৃতি কেন তোমার কাছে এত মূল্যবান?"

" না ঠাকুরদা, সমাজকে আমি দূরে সরিয়ে দিতে চাইছি না। মানুষ তো সামাজিক প্রাণী। সমাজকে স্বীকার করা, আর নিজে স্বীকৃত হাওয়াটাই তো অকারণের এই জীবনটা বয়ে নিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। কিন্তু আমার একটাই আবেদন, সেই দেওয়া-নেওয়া'টুকুর মধ্যে যেন একটা স্বচ্ছতা থাকে, একটা আন্তরিকতা থাকে, একে অপরের প্রতি একটা সম্মান থাকে। ওই যে রবি ঠাকুর বলেছেন না, 'পথ আমারে সেই দেখাবে যে আমারে চায়–
আমি অভয় মনে ছাড়ব তরী, এই শুধু মোর দায়' ? কেন আমরা এমনি নির্ভীক হতে পারব না? অচলায়তনের দুটো নিয়ম ভাঙলে ক্ষতি কিসের? যে যেমন তাকে আমরা তেমন করেই গ্রহণ করব না কেন?" বড্ড একটা আফসোসের দীর্ঘশ্বাসেই যেন থামলো আঁখি।

"তুমি যে নিজের শব্দে নিজেই ধরা দিচ্ছ দিদি" ধূসর দাঁড়ি গোঁফের ফাঁকে ঠাকুরদার চিরসবুজ হাসিমুখ খানা বলে চলছে, " যে যেমন তাকে আমরা তেমন করেই গ্রহণ করব না কেন? তার ভালোটুকু নিয়ে যেমন উচ্ছ্বসিত হলাম, তার মন্দটুকুতে সামান্য ছাড় দিলেই বা ক্ষতি কিসের? আর সেই ভালোমন্দের টানাপোড়েনেও তো দিব্যি জমে উঠতে পারে একটা ভরভরন্ত জীবন গাথা। ঠিক কি না, দিদিভাই? তাহলে চলো যে যেমন তাকে আমরা তেমন করেই গ্রহণ করি। আর এই হোক আমাদের নতুন বছরের শপথ।"

একটু গদগদ স্বরেই আঁখি বলল, "তবে তাই হোক। আর তাহলে কিন্তু তুমি আমায় আর মোটেই ভ্যাঙ্গাতে পারবে না, সকালে ঘুম থেকে না ওঠার জন্য।"

"জো হুকুম! কিন্তু পয়লা বৈশাখের সকলে যখন আমরা ঝগড়া করলামই, তখন তো রোজ ঝগড়াটা চালিয়ে যাওয়া তোমার ঠানদির মান রাখতে আমাদের একটা কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। তবে সেই প্রাত্যহিক ঝগড়ার নির্ঘণ্টে না হয় দিনের অন্য সময় গুলো বরাদ্দ থাকলো। কি বলো দিদিভাই?"

ঠাকুরদা-নাতনির প্রাণখোলা হাসিতে গমগমিয়ে উঠল অদৃশ্য তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গটা, তার রেশটুকু দিব্যি টের পাওয়া যাচ্ছিল ফোনের দুই পারেই।

- সুবার্তা

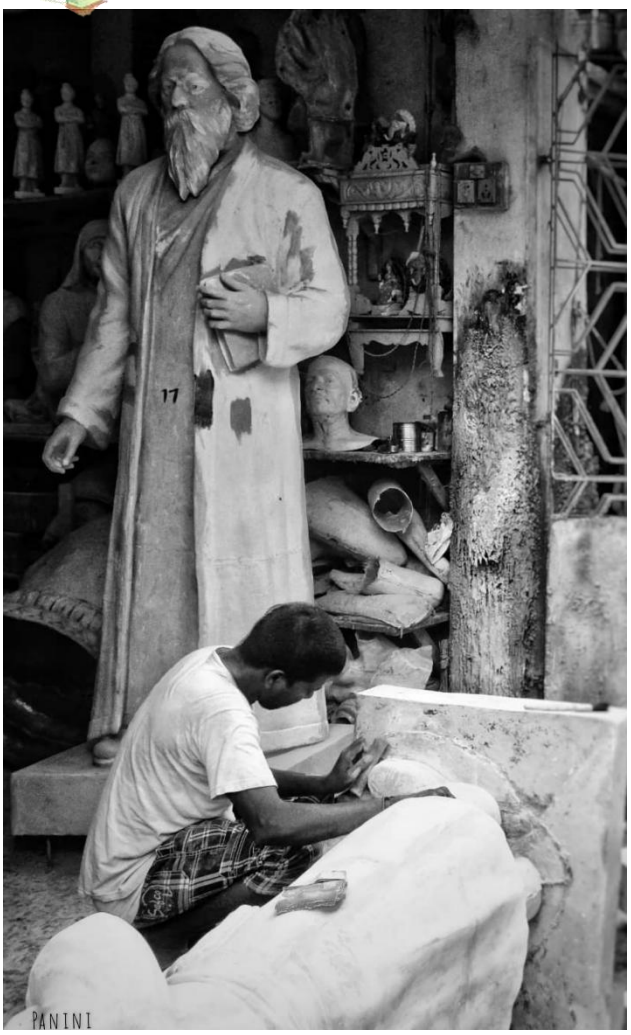

'নিশি অবসান, ওই পুরাতন
বর্ষ হল গত
আমি আজ ধূলিতলে এ জীর্ণ জীবন
করিলাম নত।
বন্ধু হও, শত্রু হও, যেখানে যে কেহ রও,
ক্ষমা কর আজকের মত
নুরাতন বছরের সাথে
পুরাতন পরিধি যত।'

" আকাশের লাগে ধাঁধা রবির আলো ওই কি বাঁধা
বুঝি ধরার মাঝে আপনাকে সে মাগল,
সর্ষেক্ষেতে ফুল হয়ে তাই জাগলো।।"

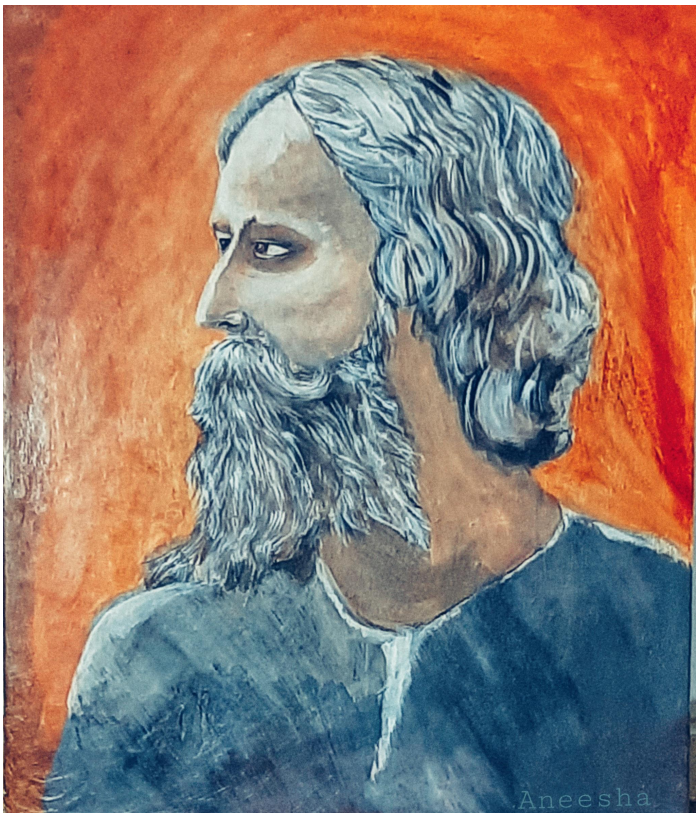

কবিপাঠ

– সৌপর্ণ দত্ত

হঠাৎ এক ঝোড়ো বাতাসের দত্ত,
চিরে রাত্রি শেষের আলো –
এক বৈশাখী ভোরে এসেছিল এক রত্তির স্বপ্ন।
হাতড়িয়ে ভোরের আলো,
লিখেছিল হাজারো অনুভূতির খেলা,
বুনেছিল এক অদ্ভুত আবেগের মেলা–
যেন ছিল যোগ তার এই ধরণীর সাথে
বহুকাল বহুদিন ধরে।
পাল্টিয়েছে যুগ, এসেছে নতুন ভোর,
কোকিলের কণ্ঠে ওঠে বেজে পরিবর্তনের সুর,
তবু বেঁচে আছে সে স্বপ্ন সবার হৃদয়ে,
কারণ,
সে অমর
তোমার মৃত্যু নেই
সে যে মৃত্যুঞ্জয়ী।।

'হে নূতন, এসো তুমি সম্পূর্ণ গগন পূর্ণ করি

পুঞ্জ পুঞ্জ রূপে'

নির্দেশনায়

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, Faculty Coordinator (MECHATRIX)

সংযোজনায়

সৌপর্ণ দত্ত, ৪র্থ বর্ষ

কৃষ্ণেন্দু অধিকারী, ৩য় বর্ষ

পানিণী পাল, ৩য় বর্ষ

অনীশা চক্রবর্তী, ৩য় বর্ষ

সুবার্তা হালদার, ৩য় বর্ষ